রাহে বেলায়াত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - বেলায়াত ও যিকর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

জ. মাসনূন যিকরের শ্রেণীবিভাগ - ৭. দু'আ বা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি - (খ) দু'আর সুন্নাত-সম্মত নিয়ম ও আদব - প্রথম ভাগ

১. হালাল ভক্ষণ ও হারাম বর্জন

দু'আ, যিকর ও সকল প্রকার ইবাদত বন্দেগি কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত এ সকল ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল উপার্জন নির্ভর হতে হবে এবং সকল প্রকার হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকতে হবে। যে ব্যক্তি হারাম বা অবৈধ সম্পদ উপার্জন করেন এবং তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তার কোনো ইবাদত ও দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন না বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে।

এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"হে মানুষেরা, আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র (বৈধ) ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না। আল্লাহ মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন

যে নির্দেশ তিনি নবী ও রাসূলগণকে দিয়েছেন (বৈধ ও পবিত্র উপার্জন ভক্ষণ করা)। তিনি (রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়ে) বলেছেনঃ হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর তা আমি জানি।[1] (আর তিনি মুমিনগণকে একই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন) : হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে পবিত্র রিযিক ভক্ষণ কর।"[2] এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি (হজ্ব, উমরা ইত্যাদি পালনের জন্য, আল্লাহর পথে) দীর্ঘ সফরে রত থাকে, ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দু'আ করতে থাকে, হে পভু! হে প্রভু !! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার পানীয় হারাম এবং হারাম উপার্জনের জীবিকাতেই তার রক্তমাংস গড়ে উঠেছে। তার দু'আ কিভাবে কবুল হবে! "[3]

প্রিয় পাঠক, পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, এই ব্যক্তি দু'আ কবুল হওয়ার অনেকগুলি আদব ও নিয়ম পালন করেছে। সে মুসাফির অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসাফিরের দু'আ কবুল হয়। সে ধূলি ধূসরিত ও অসহায় অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিনয়, আকুতি ও অসহায়ত্ব প্রকাশকারীর দু'আ কবুল করা হয়। সে হাত তুলে দু'আ করেছে, যা

দু'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। এত কিছু সত্ত্বেও তার দু'আ কবুল হবে না। কারণ তার উপার্জন হারাম। সে হারাম উপার্জন থেকে

খেয়েছে, পান করেছে ও পরিধান করেছে। হারাম জীবিকার উপর নির্ভরকারীর কোনো প্রার্থনা কবুল করা হয় না।

এই হাদীসে আমরা দেখি যে, হালাল, বৈধ ও পবিত্র জীবিকার উপর নির্ভর করা সকল যুগের সকল নবী, রাসূল ও বিশ্বাসীগণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সকল যুগের সকল নবী ও তাঁদের উম্মতগণের জন্য তাওহীদের পরেই ইসলামের যে মৌলিক বিধান অপরিবর্তনীয় রয়েছে তা হচ্ছে হালাল ও বৈধ উপার্জনের উপর নির্ভর করা।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখতে পাই যে, সৎকর্ম করার নির্দেশ বৈধ জীবিকা অর্জনের নির্দেশের পরে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, উপার্জন ও জীবিকা বৈধ না হলে কোনো সৎকর্মই কবুল হবে না। উপরের হাদীসে বিশেষভাবে দু'আর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য অনেক হাদীসে সকল ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لا يصعد إلى الله إلا الطيب

"বৈধ ও হালাল জীবিকার ইবাদত ছাড়া কোনো প্রকার ইবাদত আল্লাহর নিকট উঠানো হয় না।"[4]

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বসরার প্রশাসক ও আমীর আব্দুল্লাহ ইবনু আমিরকে তার অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান। ইবনু আমির বলেন, ইবনু উমার, আপনি আমার জন্য একটু দু'আ করুন না! ইবনু উমার তার জন্য দু'আ করতে অসম্মত হন। কারণ তিনি ছিলেন আঞ্চলিক প্রশাসক। আর এ ধরনের মানুষের জন্য হারাম, অবৈধ, জুলুম, অতিরিক্ত কর, সরকারি সম্পদের অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে নিপতিত হওয়া সম্ভব। একারণে ইবনু উমার (রাঃ) উক্ত আমীরের জন্য দু'আ করতে অস্বীকার করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ

لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكابت على البصرة

"ওযু গোসল ছাড়া কোনো সালাত কবুল হয় না, আর ফাঁকি, ধোঁকা ও অবৈধ সম্পদের কোনো দান কবুল হয় না।" আর আপনি তো বসরার গভর্নর ছিলেন।[5]

কত কঠিন সিদ্ধান্ত! অবৈধ ও দুর্নীতিযুক্ত উপার্জনে লিপ্ত মানুষের জন্য তাঁরা দু'আ করতেও রাজি ছিলেন না! এ বিষয়ে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অগণিত মতামত আমরা দেখতে পাই। তাঁরা একবাক্যে বলেছেন যে, জুলুম, অত্যাচার, দুর্নীতি, ফাঁকি বা অন্য কোনো প্রকার অবৈধ উপার্জনের অর্থ দিয়ে বা বৈধ সম্পদের মধ্যে এরূপ অবৈধ সম্পদ সংমিশ্রিত করে তা দিয়ে যদি কেউ হজ্ব, উমরা, দান, মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা নির্মাণ, জনকল্যাণমূলক কর্ম, আত্মীয়স্বজন ও অভাবী মানুষদের সাহায্য, ইত্যাদি নেক কর্ম করে তাহলে তাতে তার পাপই বৃদ্ধি হবে, কোনো প্রকার সাওয়াবের অধিকারী সে হবে না। এমনকি এ ধরনের জুলুম, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি বা অবৈধ উপার্জনের অর্থে

তৈরি কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ব্যবহার করতেও তাঁরা নিষেধ করেছেন।[6]

হারাম বা নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করা দুই প্রকারে হতে পারে। প্রথমত এরূপ কিছু ভক্ষণ করা যা আল্লাহ স্থায়ীভাবে মুমিনের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন; যেমন, শূকরের মাংস, মৃত জীবের মাংস, মদ, প্রবাহিত রক্ত, ইত্যাদি। এগুলি ইসলামে স্থায়ী হারাম। কেউ এগুলিকে হালাল ভাবলে তার ঈমান নষ্ট হবে এবং সে অমুসলিম বলে বিবেচিত হবে। আর হারাম জেনেও কোনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে খেলে গোনাহ হবে। তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে জীবন রক্ষার জন্য খেলে কোনো গোনাহ হবে না। এ ধরনের হারাম দ্রব্য 'হারাম উপার্জনের' মধ্যে ধরা হয় না। এগুলি 'কবীরা গোনাহ' ও আল্লাহর অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত, বান্দা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। দ্বিতীয় প্রকারের হারাম ভক্ষণ হলো অবৈধ ও নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জন করে তা ভক্ষণ করা। এই প্রকারের হারাম ভক্ষণে অনেক মুসলিম লিপ্ত হন। এতে তার ধর্মজীবন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

হারাম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা অন্যতম যিকর। অপর পক্ষে যদি যাকির হারাম সম্পদ বর্জন করতে না পারেন তাহলে তার সকল যিকর ও সকল ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য এখানে আমি আমাদের সমাজের হারাম উপার্জনগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাচ্ছি। ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম উপার্জনের মূল উৎসগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

(ক) সুদ : কুরআন করীমে বারংবার সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহর বিধান প্রদানের পরেও সুদের মধ্যে লিপ্ত থাকবে তাদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের অনন্ত যুদ্ধ ঘোষিত থাকবে।[7] হাদীস শরীফে সকল প্রকার সুদকে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুদভিত্তিক উপার্জনের সাথে জড়িত সকলকে: সুদ গ্রহিতা, দাতা, লেখক ও সুদি লেনদেনের সাক্ষী সবাইকে রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিশাপ বা লা'নত প্রদান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[8]

এভাবে ইসলামী শরীয়তে সুদের মাধ্যমে উপার্জিত সকল সম্পদ কঠিনতম হারাম উপার্জন। সুদখোর, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋণ, বিনিয়োগ বা অনুদান ইত্যাদির নামে নগদ অর্থ ঋণ প্রদান করে এবং গ্রহীতার নিকট থেকে উক্ত অর্থের জন্য সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে তার উপার্জন যেমন হারাম, তেমনি সুদ-দাতা, অর্থাৎ যিনি সুদে ঋণ গ্রহণ করেন এবং সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেন তিনিও কঠিন হারাম কর্মে লিপ্ত।

সুদের বিভিন্ন প্রকার আছে। প্রধান প্রকার - ঋণ বা অর্থ প্রদান করে সময়ের উপর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ। আমাদের দেশের ব্যাংকগুলির সকল প্রকার লেনদেন ও লাভ, বিভিন্ন বন্ড, সঞ্চয় পত্র ইত্যাদির লাভ সবই সুদ। ব্যাংক, এন.জি.ও., সমিতি ইত্যাদির ঋণও সুদভিত্তিক। বীমা কোম্পানীগুলির দেওয়া লাভ ও বীমাও সূদ। ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক ব্যাংক, এন. জি. ও. ও বীমা পরিচালনার চেষ্টা করা হচ্ছে। যথাযথ ইসলামী শরীয়ত মত চলছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে মুমিন এরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে পারেন।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: "আল্লাহ বেচাকেনা বা ব্যবসা বৈধ করেছেন এবং সুদ অবৈধ করেছেন।"[9] ইসলামী শরীয়তে সুদ ও ব্যবসায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের অন্যতম যে, সুদ অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ অথবা কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের

বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য গ্রহণ। আর ব্যবসা পণ্যের বিনিময়ে অর্থ বা অর্থের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণ। বেচাকেনা বা ব্যবসায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। যেমন নগদ ব্যবসা, বাকি ব্যবসা ও অগ্রিম ব্যবসা। নগদ ব্যবসায়ে পণ্য ও মূল্য হাতেহাতে লেনদেন হয়। বাকি ব্যবসায়ে পণ্য আগে গ্রহণ করে পরে মূল্য প্রদান করা হয়। আর অগ্রিম ব্যবসায়ে মূল্য আগে গ্রহণ করা হয় এবং পণ্য পরে প্রদান করা হয়। বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল বাজার দরের চেয়ে কিছু বেশি রাখা এবং অগ্রিম বিক্রয়ের জন্য পণ্যের মূল্য বাজার দর থেকে কিছু কম রাখা অবৈধ নয় বা সুদ নয়। তবে এরূপ ব্যবসায়ের জন্য অনেক শর্ত রয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই পণ্য, মূল্য, মূল্য প্রদানের সময় ইত্যাদি সুনির্ধারিত হতে হবে। নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রমের কারণে নির্ধারিত মূল্য বা পণ্যের মধ্যে আর কোনো কমবেশি বা হেরফের করা যাবে না। এ সকল শর্ত ও পার্থক্য হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থ থেকে বা আলিমদের নিকট থেকে ভালভাবে জেনে মুমিন এ জাতীয় লেনদেন করতে পারেন। সকল ক্ষেত্রে সুদ ও অবৈধ ক্রয়বিক্রয় থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

অনেক সময় ইসলামী বৈধ ব্যবসায় ও অবৈধ সুদি লেনদেনের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য মুমিনকে ধোঁকা দিতে পারে। ৫০০০ টাকা নগদ গ্রহণ করে দু-এক বৎসরের কিস্তিতে ৬০০০ টাকা প্রদান সুদ। পক্ষান্তরে ৫০০০ টাকা মূল্যের একটি সাইকেল বাকিতে ৬০০০ টাকায় বিক্রয় করা বৈধ। বাকির মেয়াদ এবং একবারে বা কিস্তিতে প্রদানের বিষয় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, উভয় বিষয় তো একই। কাজেই একটি বৈধ ও অন্যটি অবৈধ হওয়ার কারণ বা যুক্তি কি হতে পারে? বস্তুত একটি বৈধ ও অন্যটি অবৈধ হওয়ার অনেক যুক্তি ও কারণ রয়েছে, যেগুলির আলোচনা এই পুস্তকের পরিসরে সম্ভব নয়। তবে মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) নির্দেশ। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, বিলাল (রাঃ) উন্নত মানের বুরনি খেজুর এনে দেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে। তিনি বলেন, বেলাল, তুমি এ খেজুর কোথা থেকে পেলে? তিনি বলেন, আমাদের নিকট খারাপ খেজুর ছিল, আমি প্রতি দু সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভাল খেজুর হিসেবে খারাপ খেজুর বিক্রয় করে এই ভাল খেজুর কিনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আহা! এই তো সুদ! তোমার প্রয়োজন হলে, তুমি খারাপ খেজুর নগদ টাকায় বিক্রয় করে সেই টাকায় ভাল খেজুর ক্রয় করবে।"[10]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ২০ টাকা কেজি মূল্যের ৩ কেজি ভাল চাউলের বিনিময়ে ১৫ টাকা কেজি মূল্যের ৪ কেজি খারাপ চাউল প্রদান বা গ্রহণ করলে তা সুদ হবে। অথচ উক্ত চার কেজি কমা চাউল নগদ বিক্রয় করে ৩ কেজি ভাল চাউল নগদ ক্রয় করলে তা সুদ হবে না। এখন যদি কেউ লেনদেনের ফলাফল একই বলে দাবি করেন তবে মুমিন তা গ্রহণ করবেন না। বরং উভয়ের পার্থক্য অনুধাবনের চেষ্টা করবেন এবং সর্বাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ পালন করবেন।

আমাদের দেশের বন্ধকী ব্যবস্থাও মূলত সুদ নির্ভর। বন্ধকী ব্যবস্থায় ঋণদাতা ঋণের নিশ্চয়তার জন্য জমি বা দ্রব্য বন্ধক রাখতে পারেন। তবে সেই বন্ধকি জমি বা দ্রব্যের মালিকানা ঋণ গ্রহীতা মালিকেরই থাকবে। এই জমি বা দ্রব্য ঋণদাতা ব্যবহার করতে পারবেন না। শুধুমাত্র জামানত হিসাবে তার নিকট রক্ষিত থাকবে। মালিকের অনুমতিতে তা ব্যবহার করলে তাকে ব্যবহারের জন্য ভাড়া বা বিনিময় দিতে হবে। যদি প্রদত্ত ঋণ ঠিক থাকে

আবার ঋণদাতা কোনো বিনিময় ছাড়া উক্ত জমি বা দ্রব্য ব্যবহার করেন তাহলে তা সুদ হবে।

(খ) ঘুষ : ঘুষকে হাদীসে কঠিনভাবে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও দালাল সবাইকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কাজের জন্য যদি কর্মী, কর্মচারী বা কর্মকর্তা সরকার বা কর্মদাতার নিকট থেকে বেতন বা ভাতা গ্রহণ করেন, তাহলে উক্ত কাজের জন্য সেবা-গ্রহণকারীর নিকট থেকে কোনোরূপ হাদিয়া, পুরস্কার, বখশিশ বা সাহায্য গ্রহণ করাই ঘুষ। চেয়ে অথবা না চেয়ে, আগে অথবা পরে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, খুশি হয়ে বা বাধ্য হয়ে, টাকায় অথবা দ্রব্যে অথবা সুযোগে যেভাবেই এই অর্থ, উপহার বা সুযোগ গ্রহণ করা হোক না কেন তা সন্দেহাতীতভাবে ঘুষ বলে গণ্য হবে এবং হারাম উপার্জন হিসাবে উক্ত গ্রহীতার সাথে তার প্রভুর সম্পর্ক ছিন্ন করবে। শিক্ষকগণ বেতনের বিনিময়ে যে শিক্ষা ও সেবা প্রদানে চুক্তিবদ্ধ, ডাক্তারগণ বেতনের বিনিময়ে যে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ সেই শিক্ষা, চিকিৎসা বা সেবার বিনিময়ে ছাত্র বা রোগীর নিকট থেকে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা, উপহার বা অর্থ গ্রহণও একই ধরনের ঘুষ। এছাড়া কর্মী, কর্মচারী, কর্মকর্তা বা প্রশাসককে পদের কারণে উপহার-হাদীয়া প্রদান করাকেও ঘুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে। এমনকি কারো জন্য কোনো বৈধ সুপারিশ বা সাহায্য করার পরে সে জন্য তার থেকে হাদীয়া, উপহার বা মিষ্টি গ্রহণ করাকেও হাদীস শরীফে অবৈধ উপার্জন বলে গণ্য করা হয়েছে।

(গ) জুয়া : ইসলামে জুয়াকে হারাম উপার্জনের অন্যতম উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে জুয়া আমাদের পরিচিত। সকল প্রকার প্রচলিত লটারি জুয়া। এছাড়া সকল প্রকার বাজি জুয়া, যেক্ষেত্রে সংশিলষ্ট পক্ষগণ প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করে এবং বিজয়ী পক্ষ সকল অর্থ গ্রহণ করে। বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ খেলাধুলাও এভাবে জুয়ার মাধ্যমে আয়োজিত হচ্ছে। কিশোরগণও এখন জুয়া নির্ভর হয়ে গিয়েছে! খেলাধুলা বা বৈধ প্রতিযোগিতায় ৩য় পক্ষ পুরস্কার দিতে পারে।

(ঘ) জুলুম, জোর করা বা কেড়ে নেওয়া : কুরআন ও হাদীসে জোর বা অনিচ্ছার মাধ্যমে কারো অর্থ গ্রহণ করাকে হারাম উপার্জনের অন্যতম দিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোনো প্রকারে কারো নিকট থেকে কোনো প্রকারের অর্থ, উপহার, সুবিধা বা

কোনোকিছু গ্রহণ করাই হারাম। এভাবে যা কিছু গ্রহণ করা হয় সবই অপবিত্র উপার্জন। সকল প্রকার চাঁদা, যৌতুক, জবরদস্তিমূলক উপহার, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি এই জাতীয় হারাম উপার্জন। কিছু ক্রয় করে প্রভাব দেখিয়ে মূল্য কম দেওয়া, শক্তি ও প্রভাবের কারণে রিকশা, গাড়ি, শ্রমিক ইত্যাদির ভাড়া বা পারিশ্রমিক কম দেওয়া একই শ্রেণীর জুলুম। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের প্রাপ্য টাকা-পয়সা, সরকারি অনুদান, সম্পত্তি ইত্যাদি পুরো বা আংশিক চাপ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে গ্রহণ করাও এই পর্যায়ের উপার্জন। এ ধরনের সকল উপার্জনই হারাম, তবে সবচেয়ে নোংরা হারাম উপার্জন যৌতুক। এ জাতীয় অন্যতম আরেকটি জুলুম পিতার মৃত্যুর পরে পিতার সম্পত্তির শরীয়তসম্মত অংশ বোনদেরকে, এতিম বা দুর্বল প্রাপকদেরকে না দিয়ে দখল করা। কুরআন করীমে এধরনের ব্যক্তিদেরকে স্পষ্টভাবে জাহান্নামী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(ঙ) ফাঁকি, ধোঁকা, ওজনে কম-বেশি, ভেজাল, খেয়ানত বা দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ :

এগুলি সবই কঠিনতম হারাম উপার্জন। কুরআন ও হাদীসে এ সকল বিষয়ে বারবার সাবধান করা হয়েছে। কর্মস্থলে ফাঁকি দেওয়া, কর্মচারী বা কর্মদাতাকে চুক্তির চেয়ে কম কর্ম প্রদান করাও এই শ্রেণীর হারাম উপার্জন। সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার সবাই নিজ নিজ কর্ম চুক্তি অনুসারে পূর্ণ কর্ম প্রদান করতে ইসলামী শরীয়ত মতে বাধ্য। যদি কারো অসুবিধা হয় তাহলে কর্ম ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু কর্মরত অবস্থায় কর্মে অবহেলা হারাম ও এভাবে উপার্জিত বেতন হারাম। যিকর, ওয়ায, দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অযুহাতে কর্মে অবহেলা করলেও একইরূপ হারাম হবে। চিকিৎসা, ছুটি নিয়ে হজ্ব ,উমরা করাও হারাম উপার্জনের মধ্যে। হয় স্পষ্ট ও সঠিক কারণ দেখিয়ে ছুটি নিতে হবে, না হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলে বা নিজেকে উপস্থিত দেখিয়ে কর্মের বেতন গ্রহণ করা এবং সে সময়ে অন্য কর্ম করা জায়েয নয়। এভাবে উপার্জিত বেতন সন্দেহাতীতভাবে হারাম উপার্জন।

স্কুল, কলেজ, বিশববিদ্যলয়, মাদ্রাসা ইত্যাদির শিক্ষকগণ, ডাক্তারগণ নির্ধারিত সময় চাকুরি স্থলে অবস্থান করতে ও নির্ধারিত সেবা প্রদান করতে বাধ্য। যদি চাকুরির চুক্তি ও সুবিধাদি অপছন্দ হয় তাহলে বাদ দিতে পারেন। পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু চাকুরিরত অবস্থায় দায়িত্বে অবহেলা, কম পড়ানো, কম চিকিৎসা করা, ছাত্র বা রোগীকে অতিরিক্ত সেবা গ্রহণের জন্য নিজস্ব কোচিং বা ক্লিনিকে যেতে উৎসাহিত করা - সবই হারাম এবং এভাবে উপার্জিত অর্থ হারাম।

সকল প্রকার ভেজাল, ধোঁকামূলক ব্যবসা এই শ্রেণীর হারাম। কোনো দ্রব্যের কোম্পানির বা প্রস্তুতকারকের নাম, ক্রয়মূল্য ইত্যাদি মিথ্যা বলে বিক্রয় করাও একই পর্যায়ের হারাম।

মুহতারাম পাঠক, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সমাজে ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ বলে কথিত সাধারণ মানুষ, আলিম, নেতা, দরবেশ, তালেবে ইলম (লেখকসহ), যাকির, মুজাহিদ অনেকেই নির্বিচারে হারাম জীবিকার উপর নির্ভর করছেন। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ভেজাল, ওজনে কম-বেশি ইত্যাদি হারামে লিপ্ত, চাকুরিজীবী কর্মে ফাঁকি, অবহেলা ইত্যাদি হারামে লিপ্ত।

আমরা প্রত্যেকে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আছে এমন সকল হারাম জীবিকা অর্জন করতে দ্বিধা করি না। তবে আমাদের সাধ্যের বাইরে যেসকল হারাম উপার্জন তা আমরা ঘৃণা করি। যেমন, স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মে ফাঁকি দিয়ে হারাম উপার্জন করেন, তবে তিনি মন্ত্রী, সচিব ও নেতাদের কর্মে অবহেলার নিন্দা করেন। সাধারণ ধার্মিক পিতা ও যুবক অতীব আগ্রহের সাথে যৌতুকের মাধ্যমে হারাম উপার্জন গ্রহণ করেন, তবে রাজনৈতিক নেতাদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, দুর্নীতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। সুযোগ পেলে নিজের বোন ও এতিম ভাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, অর্থ ইত্যাদি অনেকেই আত্মসাৎ করেন, অথবা স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ বা ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অর্থ কিছুটা এদিক সেদিক করে হজম করে নেন। তবে তিনি তার সাধ্যের বাইরে বড় বড় দুর্নীতি ও আত্মসাতের ঘটনায় বিচলিত হন।

অনেক সময় আমরা আবার এসকল হারাম উপার্জনকে যুক্তিসঙ্গত করতে চাই। সরকার আমাদের ঠিকমতো বেতন দেয় না, ঠিকমতো পড়াবো কেন? ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করব কেন? বেতনে পেট চলে না তাই মিথ্যা তথ্য দিয়ে কিছু ভাতা নিয়ে নিলাম, ইত্যাদি। হারামকে হারাম জেনে ও মেনে তাতে লিপ্ত হলে ঈমান কিছুটা বাকি থাকে ও তাওবার সুযোগ থাকে। কিন্তু এধরনের যুক্তি দিয়ে হারামকে হালাল করে নিলে তাও থাকে না। কর্মদাতা যদি চুক্তি

অনুযায়ী বেতন দেন, তাহলে কর্মী চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ কর্ম প্রদানে বাধ্য। চুক্তিতে অন্যায় থাকলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, অথবা চুক্তির কর্ম ছেড়ে দিতে হবে। চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তির কর্মে ফাঁকি দিয়ে যে বেতন গ্রহণ করা হবে তা নিঃসন্দেহে হারাম উপার্জন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতের এই অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ

"মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ নির্বিচারে যা পাবে তাই গ্রহণ করবে। হালাল সম্পদ গ্রহণ করছে না হারাম সম্পদ গ্রহণ করছে তা বিবেচনা করবে না।"[11]

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে :

فإذا ذلك لا تجاب لهم دعوة

"যখন এই অবস্থা হবে, তখন তাদের কোনো দু'আ কবুল করা হবে না।"[12]

মুহতারাম পাঠক, এ সকল হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, হারাম জীবিকা বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। মানুষ যত পাপী হোক, যত অবাধ্য হোক মহান প্রভুর সাথে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁধন দু'আর সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। যখনই প্রভুকে ভুলে প্রভুর অবাধ্যতায় লিপ্ত এই মানুষটি বিপদে আপদে বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রভুর দরবারে হাত উঠায়, তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। কিন্তু হারাম জীবিকা বান্দার সাথে প্রভুর এই ঘনিষ্টতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। কী কঠিন পরিণতি!

প্রশ্ন হলো, সব পাপেরই তো ক্ষমা আছে, এ পাপের কি ক্ষমা নেই? উত্তর হলো, সকল পাপের ক্ষমাই তাওবার মাধ্যমে হয়। তবে সাধারণ যে কোনো কঠিন পাপের তাওবা যত সহজ হারাম উপার্জনের তাওবা তত সহজ নয়। একজন মদ্যপ, ব্যভিচারী, বে-নামাযী এমনকি কাফির যে কোনো সময় তার পাপে অনুতপ্ত হয়ে তার প্রভুর কাছে বেদনার্ত ও ব্যথিত মনে অনুতাপ করে আর পাপ করব না বলে সিদ্ধান্ত নিলেই তার তাওবা হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন বলে কুরআন করীমে ও অগণিত হাদীসে বলা হয়েছে। কিন্তু যে পাপের সাথে কোনো বান্দার হক জড়িত সে পাপের ক্ষেত্রে তাওবার অন্যতম শর্ত অনুতাপ, ক্রন্দন ও পাপ পরিত্যাগের সিদ্ধান্তসহ যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তার নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করতে না পারলে তাদের অংশ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সকল হারাম উপার্জনের মূল কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করা। হারাম উপার্জন থেকে তাওবার জন্য প্রথমে গভীরভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার অবৈধ উপাজন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তৃতীয়ত, যাদের নিকট থেকে অবৈধভাবে সম্পদ গ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে, বা তাদের উত্তরাধিকারীগণকে তা ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা নিতে হবে। - এই তৃতীয় শতটিই সবচেয়ে কঠিন। এতে অক্ষম হলে অবৈধভাবে উপার্জিত সকল অর্থ ও সম্পদ যাদের সম্পদ তাদের নামে বিলিয়ে দিতে

হবে, বেশি করে তাদের জন্য দু'আ করতে হবে, বেশি করে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে, যেন তাদের এই হক আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। সর্বোপরি খুব বেশি করে সাওয়াবের কাজ করতে হবে, যেন পাওনাদারদের দেওয়ার পরেও নিজের কিছু থাকে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর দরবারে নিজের অসহায়ত্ব, আকুতি ও বেদনা পেশ করে সদা সর্বদা তাওবা করতে হবে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেছেন, এসব কিছুর পরও তার আখেরাতের নিরাপত্তার বিষয়ে কিছুই বলা যাবে না।

মুহতারাম পাঠক, অবৈধ উপার্জনকারীর সকল কর্ম, সকল প্রার্থনা অর্থহীন হওয়ার পাশাপাশি তার অবৈধ উপার্জনের জন্য আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এক হাদীসে আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো মুসলিমের কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করবে তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম নিশ্চিত করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করা হবে।" এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহর রাসূল, যদি সামান্য কোনো জিনিস অবৈধভাবে গ্রহণ করে? তিনি উত্তরে বলেনঃ যদি 'আরাক' গাছের এক টুকরো খন্ডিত ডালও কেউ অবৈধভাবে গ্রহণ করে তাহলে তারও এই শাস্তি।"[13]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "যদি কেউ কাউকে জুলুম করে থাক বা ক্ষতি করে থাক তাহলে জীবদ্দশায় তার নিকট থেকে ক্ষমা ও মুক্তি নেবে। কারণ আখেরাতে টাকাপয়সা থাকবে না, তখন অন্যায়কারীর নেক আমলগুলি ক্ষতিগ্রস্তকে প্রদান করা হবে। যখন নেক আমল থাকবে না তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাপগুলি অন্যায়কারীর কাঁধে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে।"[14]

আরেক হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) (একদিন) বললেন : "তোমরা কি জান কপর্দকহীন অসহায় দরিদ্র কে?" আমরা বললামঃ "আমাদের মধ্যে যার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই সেই কপর্দকহীন দরিদ্র।" তিনি বললেন: "সত্যিকারের কপর্দকহীন দরিদ্র আমার উম্মাতের ঐ ব্যক্তি যে, কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাত, ইত্যাদি নেককর্ম নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ বা অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণ করেছে, কাউকে আঘাত করেছে, কারো রক্তপাত করেছে। তখন তার সকল নেককর্ম এদেরকে দেওয়া হবে। যদি হক আদায়ের পূর্বেই নেককর্ম শেষ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিদের পাপ তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[15] আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

ফুটনোট

[1] সূরা আল-মু'মুনূনঃ ৫১।

[2] সূরা আল-বাকারাঃ ১৭২।

[3] সহীহ মুসলিম ২/৭০৩, নং ১০১৫, নাবাবী শারহু সহীহি মুসলিম ৭/১০০।

[4] সহীহ বুখারী ২/৫১১, নং ১৩৪৪, ৬/২৭০২, নং ৬৯৯৩, সহীহ মুসলিম ২/৭০২, নং ১০১৪।

[5] সহীহ মুসলিম ১/২০৪, নং ২২৪।

[6] দেখুনঃ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৫/২০, ইবনু রাজাব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ১২৩-১২৯।

[7] সূরা বাকারাঃ ২৭৫-২৭৯, সূরা আলে ইমরানঃ ১৩০, সূরা নিসাঃ ১৬১, সূরা রূমঃ ৩৯।

[8] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৬৬, ২/৭৩৩-৭৩৫, ৭৮০, ৮১৩, ৩/১০১৭,; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯২, ৩/১২০৮-১২১৯।

[9] সূরা বাকারাঃ ২৭৫।

[10] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮১৩; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১২১৫-১২১৬।

[11] সহীহ বুখারী ২/৭২৬, নং ১৯৫৪।

[12] আত-তারগীব ২/৫৩৮, নং ২৫৭৬।

[13] সহীহ মুসলিম ১/১২২, নং ১৩৭।

[14] সহীহ বুখারী ৫/২৩৯৪, নং ৬১৬৯।

[15] সহীহ মুসলিম ৪/১৯৯৭, নং ২৫৮১।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8743

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন